বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

সম্পাদকীয়, সাক্ষাৎকার

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প তদারকে কাউন্সিল অব অ্যাডভাইজরস গঠন করা প্রয়োজন

২১:৩৯:০০ মিনিট, জুন ১৮, ২০১৭, পৃঃ ০৪

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। বর্তমানে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। সদ্য লুপ্ত পে-কমিশনের চেয়ারম্যানও ছিলেন। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এ বিভাগেই। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি সোনালী ব্যাংক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক, সাধারণ বীমা করপোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যও

ছিলেন। সম্প্রতি প্রস্তাবিত বাজেটের নানা দিক নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এম এম মুসা**

এবারের বাজেটের কয়েকটি ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জানতে চাই—

এবারের বাজেটে অনেকগুলো শক্ত ইতিবাচক দিক রয়েছে, তা সত্ত্বেও এ বাজেট ঘিরে এত সমালোচনা কেন হচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। তবে আমি এটাও বলব, সব শিল্প-বাণিজ্য অ্যাসোসিয়েশন যখন একসঙ্গে বলে যে বাজেট ভালো হয়নি— সেক্ষেত্রে ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনগুলো সবসময় সাধারণত কর হ্রাসের জন্য বলে থাকে। এ দাবি তারা করতেই পারে, কিন্তু সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো রাজস্ব। আর রাজস্ব আহরণ করতে গেলে কোথাও না কোথাও কর বৃদ্ধি ও করজালের বিস্তার করতে হয়, কমানোর প্রশ্ন ওঠে না। তবে করজাল বিস্তারের সর্বজনীন দাবি মানতেই হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, ছোট বাজেট-বড় বাজেট নিয়ে। আমাদের বাজেটের পরিধি (আমি একে 'পরিধি' অথবা 'সাইজ' বলি, আকার কখনো বলি না) ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটের চার গুণেরও বেশি এবং মোট দেশজ আয় বা জিডিপির ১৮ শতাংশ; যেখানে আফগানিস্তানের বাজেট জিডিপির অনুপাত ২৯ শতাংশ, ভারতের ২৮ আর নেপালের ২২ শতাংশ। কাজেই বাজেট মোটেও বড় নয়। বাজেট বাস্তবায়ন হয় না বা বাস্তবায়নযোগ্য নয়, সে কথাও কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলা ঠিক হবে না। কারণ বাজেট যদি বাস্তবায়ন না-ই হতো, তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ১১-এর জায়গায় ৭ দশমিক ২, পরবর্তীতে ৭ দশমিক ২৪ কীভাবে হয় কিংবা মাথপিছু আয় মার্কিন ডলারে কী করে ক্রমোন্নতি হয়ে ১ হাজার ৬০২ হয়! এবারের বাজেটে আমদানি প্রতিযোগী দেশজ শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবহন খাতে বাড়তি বরাদ্দ অত্যন্ত ইতিবাচক।

প্রস্তাবিত বাজেট ঘিরে মূল্যস্ফীতির কতটা শঙ্কা রয়েছে?

কেউ কেউ খুব জোর দিয়ে বলছেন, মূল্যস্ফীতি হবে। তারা এটি কোনো হিসাবের ভিত্তিতে নয়, সম্ভবত অনুমানের ওপর ভর করে বলছেন। মূল্যস্ফীতি হবে কিনা, তা নির্ভর করে এনবিআর কতটুকু দক্ষতার সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর আদায় করতে পারবে। যদি নিয়মমতো কর আদায় হয়, তাহলে মূল্যস্ফীতির কোনো কারণ নেই। আমি সবসময় একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি— এক ব্যক্তি ১০০ টাকার কাঁচা তুলা কিনলেন। এক্ষেত্রে তুলা যিনি বিক্রি করলেন, তার মূল্য সংযোজন ১০০ টাকা। তিনি ১৫ টাকা মূল্য সংযোজন কর সরকারকে দেবেন, যিনি তুলা কিনলেন তিনি সুতা কেটে তা ১২০ টাকায় বিক্রি করলেন। ২০ টাকার ওপর ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর হবে ৩ টাকা, পরবর্তীতে যিনি ওই সুতা কিনে কাপড় বানালেন, তিনি ওই কাপড়টা দর্জির কাছে ১৫০ টাকায় বিক্রি করলেন, এখানে ৩০ টাকার মূল্য সংযোজন হয়েছে। ১৫ শতাংশ হারে এখানে মূল্য সংযোজন কর ৪ টাকা ৫০ পয়সা। এবার তিনি পণ্যটি একজন দোকানদারের কাছে ১৮০ টাকায় বিক্রি করলেন, এ পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হয়েছে ৩০ টাকা আর মূল্য সংযোজন কর ৪ টাকা ৫০ পয়সা। এবার দোকানদার পণ্যটি চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে বিক্রি করলেন ২০০ টাকায়। তিনি ২০ টাকা মূল্য সংযোজন করলেন, যেখানে মূল্য সংযোজন কর ৩ টাকা। তাহলে (১৫+৩+৪.৫০+৪.৫০+৩) মিলে মোট মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে ৩০ টাকা। এক্ষেত্রে সেলস ট্যাক্স প্রতিস্থাপন করছে মূল্য সংযোজন কর। যদি লক্ষ্য ঠিক করে স্তরে স্তরে গিয়ে এ কর

দক্ষভাবে আদায় করা যায়, তাহলে যে ৩০ টাকা আগে আদায় হতো, তা এখনো আদায় হবে। কাজেই মূল্যস্ফীতির কোনো কারণ নেই। যারা মূল্যস্ফীতির কথা জোরেশোরে বলছেন, তারা বোধহয় ধরে নিয়েছেন প্রত্যেক স্তরে পুরো জিনিসটার মূল্য সংযোজন কর দিতে হবে। এটা তো হতে পারে না।

বর্তমান বাজেট ঘিরে ব্যবসায়ীরা অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কী?

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ভ্যাট অব্যাহতির সীমা বিদ্যমান ৩০ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ লাখ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ মাসে গড়ে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারধারী প্রতিষ্ঠানের কোনো করই দিতে হবে না। ব্যবসায়ীদের চাহিদা মোতাবেক টার্নওভার করের সীমা বিদ্যমান ৮০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের মাসিক টার্নওভারের পরিমাণ গড়ে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচে, তারা মাত্র ৪ শতাংশ হারে টার্নওভার কর পরিশোধ করবেন। এটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অনন্যসুযোগ, যা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। কাজেই আমাদের শিল্প-ব্যবসায়ী বন্ধুরা যে মনে করছেন, বাজেটের মধ্যে কোনো ইতিবাচক দিক নেই— এটা বোধহয় ঠিক নয়। আমি তাদের অবস্থাটাও বুঝি। যদিও করপোরেট কর দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় আছে এবং তারা বলছেন— লাভের সিংহভাগটা যদি সরকার নিয়ে যায়, তাহলে কী করে ব্যবসা বড় করবেন। করপোরেট করের হার হয়তোবা কমানো সম্ভব। করহার কমালে যদি বেশি লোকে কর দেন এবং হার কমানোর যে হার, তার চেয়ে যদি কর রাজস্ব বৃদ্ধির হার বেশি হয় তাহলে রাজস্ব বাড়বে। আমাদের ট্যাক্স জিডিপি অনুপাত মাত্র ১০ শতাংশ। অল্প লোকে ট্যাক্স দেয়। করহার কমানো হলে এ থেকে উত্তরণ ঘটতে পারে।

আয়করে আড়াই লাখ টাকার ঊর্ধ্বসীমা না বাড়ানোর পক্ষে অর্থমন্ত্রীর যুক্তি খুবই জোরালো। এটি মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণ। তবে আমি মনে করি, প্রথম স্তরটিতে করহার ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা যেতে পারে। তাহলে নতুন অনেক করদাতা এতে যুক্ত হবেন। রাজস্ব বাড়তে পারে। এরপর পরবর্তী ৬ লাখের জন্য ১০ শতাংশ হবে, এখানে একটা নতুন স্তর আমি যোগ করছি, পরবর্তী সব স্তরে কর প্রদেয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। আর চূড়ান্ত স্তরে করহার ২৫ শতাংশ হতে পারে। একই সঙ্গে অপ্রদর্শিত আয়ের ওপর ৪০ শতাংশ কর থাকবে। তবে এর স্থিতি হবে এক বছরের। এরপর যদি ৪০ শতাংশ হারে আয়কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করা না হয় এবং যদি কারো কাছে অপ্রদর্শিত আয় থাকে, তবে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তা কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সরকারের একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকবে যে, ৪০ শতাংশ হারে আয়কর দিয়ে পরিচ্ছন্ন আয় সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে না। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটের আরো একটি ইতিবাচক দিকের মধ্যে রয়েছে দেশী কম্পিউটার, সেলফোনের ওপর বেশকিছু প্রণোদনা দেয়া। দেশী শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেই হবে। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০ শতাংশের মতো। এটি দ্রুত বাড়াতে হবে, না হলে শিল্পায়ন হবে না। আর শিল্পায়ন না হলে কর্মসংস্থান হবে না। সারা বিশ্বেই বেকারের হার বাড়ছে, বাংলাদেশেও তাই। জবলেস গ্রোথ চতুর্দিকে। সজ্ঞানে কর্মসংস্থানমূলক মডেল নিয়ে শিল্প খাতের অবদান বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটি করতে হলে দেশী শিল্পের সুরক্ষাও দরকার হবে, না হলে দেশী শিল্প দাঁড়াতে পারবে না। যেসব খাতে বাংলাদেশ তুলনামূলক সুবিধায় নেই, সেখানে সুরক্ষা না দিয়ে বরং এটি ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে যেখানে তুলনামূলক সুবিধা আছে, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।

এখানে নতুন নতুন ক্ষেত্র আসছে, যেমন— গুঁড়ো দুধ। এটি তৈরির প্রযুক্তি সহজলভ্য ও ক্রয়যোগ্য। যদি ঘোষণা দেয়া হয়, ২০২০–২১ সালে আর গুঁড়ো দুধ আমদানি করা হবে না; দেশী উত্পাদনে প্রণোদনা দেয়া হবে— এতে কাঁচা দুধ উত্পাদন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ স্থাপন হবে। উদ্যোক্তারা গুঁড়ো দুধ তৈরির যন্ত্রপাতি আমদানি করবেন বিনা শুল্কে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নানা প্রণোদনার মাধ্যমে তিন বছরের প্রস্তুতিতে দেশেই বিশ্বমানের গুঁড়ো দুধ উত্পাদনের ব্যবস্থা করা যায়। এ উদ্যোগের ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। আর যারা দুধ উত্পাদনের সঙ্গে জড়িত, তারা দাম বেশি পাবেন, উন্নয়ন হবে তাদের জীবনমান।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব ল অব দ্য সি (ইকলস) রায়ের কথাই ধরা যাক— ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে আইনি লড়াইয়ে বাংলাদেশ সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু এ সমুদ্রসীমার বাইরে যে গভীর সমুদ্র, সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, সেখান থেকে গত এক বছরে ভারত ও মিয়ানমার মাছ ধরেছে ৮০ লাখ টন। সেখানে বাংলাদেশ ধরেছে মাত্র ৭৫ হাজার টন মাছ। একমাত্র কারণ দেশে মাছ ধরার ভালো জাহাজ নেই। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যে দক্ষতা অর্জন করেছে দেশ, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জাহাজ তৈরিতে প্রণোদনা দেয়া হয়, তাহলে ভারত ও মিয়ানমারের মতো মাছ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। আমি শুনেছি একটা তিমির দাম কয়েক লাখ ডলার। ভারত ও মিয়ানমার কিন্তু সমুদ্র থেকে তিমি ধরছে, আমাদেরও এ ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে যেমন চীন তাদের লেবার-ইনটেনসিভ ইন্ডাস্ট্রিগুলো নতুন করে দেশান্তর করছে, আমরা এটি পুরোটা ধরতে পারিনি। ভারত, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া সজ্ঞানে তাদের স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেছে। বিপরীতে আমরা টাকাকে অতিমূল্যায়িত থাকতে দিয়েছি। ফলে আমাদের রফতানি বৃদ্ধি হওয়ার যে কথা ছিল তা হয়নি। বিলম্ব হলেও বিনিময় হারে আংশিক সংশোধন করা হয়েছে। মে মাসের রেমিট্যান্সপ্রবাহে তাই বিরাট প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। মাসখানেক আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, রেমিট্যান্স পাঠাতে কোনো ফি লাগবে না। কিন্তু বাজেটে তার উল্লেখ দেখলাম না। ওই ঘোষণাটা যদি আনুষ্ঠানিক করা হয়, তাতেও কিন্তু রেমিট্যান্সপ্রবাহ ও রফতানিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিনিময় হার যদি আগের তুলনায় যৌক্তিক করা হয়, তাহলে রফতানি আরো বাড়বে।

বাজেটে আবগারি শুল্ক বাড়ানোয় সাধারণ মধ্যবিত্ত কি ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার আগ্রহ হারাতে পারে?

বিষয়টি খুব একটা সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। এ সম্পর্কে খুব জোরেশোরে সমালোচনা হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে, ব্যাংকে ১ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রাখলে মূল্যস্ফীতির তুলনায় সুদ কম হওয়ায় এক বছর পর তা ১ লাখ টাকার নিচে চলে আসবে। দ্বিতীয় বছরে গিয়ে আবার হয়তো বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এটা তো সরকারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। ব্যাংক আমানতের ওপর আরোপিত আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি রাজস্ব তেমন বাড়াবে না। আবগারি বিষয়ে ২৯ জুন পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। যাদের ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক আমানত রয়েছে, তাদের জন্য আবগারি শুল্ক পুরোপুরি রহিত করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তকে ব্যাংকে টাকা রাখার জন্য প্রণোদনা দেয়া হবে। অনেকেই বলেছেন, আমিও আশঙ্কা করছি, ব্যাংক থেকে যদি মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমানত কমার চেয়ে আরো বড় যে বিষয়টি তা হলো— ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যেতে পারে।

বাজেটে আমাদের অন্যতম প্রধান রফতানি খাত গার্মেন্ট শিল্পকে যে সুবিধা দেয়া হয়েছে, তা কি যথার্থ?

স্বীকার করতে হবে, গার্মেন্ট শিল্পের উদ্যোক্তারা অসীম সাহসী ও দূরদর্শী। নইলে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের পক্ষে সত্তরের দশকের শেষ দিকে ব্যবসা শুরু করে পোশাক রফতানিতে বিশ্বে প্রথম দিকে জায়গা করে নেয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়া আরো একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার, যত বেশি কম্পোজিট ইউনিট হবে খাতটি তত বেশি শক্তিশালী হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠার নিয়ম হচ্ছে, বড় শিল্পগুলো ছোটদের গিলে ফেলবে। এখানে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই— এটা বাজার অর্থনীতির ধর্ম। দেশের ভেতরে যত বেশি মূল্য সংযোজন হবে তত বেশি লাভবান হবে বাংলাদেশ। দেশের ভেতর থেকেই যাতে উন্নত মানের টেক্সটাইল ফ্যাব্রিক পাওয়া যায়, সেজন্য টেক্সটাইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যেমন— টেক্সটাইল শিল্পের জন্য দেশের বাইরে থেকে যে উন্নত মানের যন্ত্রপাতি আনতে হয়, তার ওপর যতটা সম্ভব শুল্ক ছাড় দেয়া উচিত। দ্বিতীয়ত. শিল্প-কারখানায় কোয়ালিটি বিদ্যুৎ (২২০ ভোল্ট) দিতে হবে। আমি শুনেছি, প্রয়োজনবোধে প্রতিষ্ঠান মালিকরা বেশি মূল্য দিয়ে হলেও এ বিদ্যুৎ কিনতে রাজি আছেন। তৃতীয়ত. ইফুলয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) সরকার স্থাপন করবে আর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ভাড়া দিয়ে এর সুবিধা নেবে। চতুর্থত. সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আগামী বছরের শেষের দিকে সরকার এটি যদি সরবরাহ করতে সক্ষম হয় তাহলে গ্যাসের সংকট থাকবে না। শিল্প প্রসারে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে।

তবে এ গ্যাসের মূল্য অনেক বেশি হবে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি কতটা কার্যকর হবে বলে আপনি মনে করছেন?

এ কথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়, আমরা গ্যাস অনেক কম মূল্যে পাচ্ছি। গ্যাসের মূল্য বেশি হলে দেশের স্বার্থে ভর্তুকির প্রশ্নও আসতে পারে। বাজেটের আরো একটা ভালো দিক রয়েছে, যা কেউ বলছে না, সেটা হলো রেল খাত। অর্থমন্ত্রী তার বক্তব্যে কয়েকটি সেকশনে রেললাইনকে ডাবল লাইন, ব্রড গেজ ও নতুন নতুন নেটওয়ার্ক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আমাদের উপায় নেই। কারণ সড়ক ব্যবস্থায় আমরা একটা অবস্থান পর্যন্ত এসেছি এবং আমাদের প্রয়োজন রেল খাতের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেয়া। কম খরচের পাশাপাশি রেল ভ্রমণ অনেক বেশি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব। কাজেই বাজেটে রেল খাতে যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, একে আমি সাধুবাদ দিই।

এক্ষেত্রে বাজেটের ঘাটতি ব্যয় সমন্বয়ের জন্য কোন দিকগুলোকে গুরুত্ব দেয়া যায় বলে মনে করেন?

রাজস্ব আয় বাড়ানো ঘাটতি সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান। এবার বাজেটের সাইজ অনেক বড় হওয়ায় ঘাটতিটাকে অনেক বড় দেখা যাচ্ছে। এখানে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হলো, সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বেশি বেশি ধার নিক— এটা আমি সঠিক মনে করি না। কারণ ইদানীং যে বিষয়টি খুব ইতিবাচক দেখা যাচ্ছে তা হলো, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ প্রান্তিকভাবে হলেও বেড়েছে। দুই. ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ছে। তিন. মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি সেটেলমেন্টেও বাড়ছে, এলসিতেও বাড়ছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে একটা জাগরণ আসছে। এক্ষেত্রে করপোরেট কর সমন্বয় করে ব্যক্তিখাতকে আরো উত্সাহিত করতে পারলে ভালো। সেভিংস সার্টিফিকেট নিয়ে কোনো

কোনো মহলে খুব আপত্তি। আমি এটা বুঝি না, কারণ সেভিংস সার্টিফিকেট থেকে লাখ লাখ মধ্যবিত্ত পেনশনভোগী পরিবার জীবনধারণের চেষ্টা করছে। এর লভ্যাংশ কমানো ঠিক নয়।

বাজেটে বৈদেশিক ঋণের ওপর বড় ধরনের নির্ভরতা রয়েছে সরকারের। যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার কারণ কী বলে মনে করেন?

বর্তমান অর্থবছরে ৩৭০ কোটি মার্কিন ডলার ২ হাজার ২০০ কোটি ডলারের পাইপলাইন থেকে খরচ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বড় সুসংবাদ। অর্থমন্ত্রী মহোদয় ওই খাতে যে অংক রেখেছেন, তা ৬০০ কোটি ডলারের ওপর। এটি অর্জন করা সম্ভব। দেশের সবচেয়ে বড় দুর্বল দিকের একটি হলো প্রকল্প প্রণয়ন, বিশেষ করে বড় প্রকল্প প্রণয়নের সক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল। এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একটি প্রকল্প প্রণয়নের প্রশিক্ষণ দিতে ছয় মাসের বেশি সময় লাগে না। যারা যোগ্য তাদের চিহ্নিত করে ছয় মাসের জন্য খুব উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। দেশীয় পর্যায়ে এ বিষয়ের ওপর যারা বিশেষজ্ঞ, তাদের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশ থেকেও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসা যেতে পারে। প্রকল্প প্রণয়নক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। যারা এ কাজে নিয়োজিত, তারা যেন মুনশিয়ানার সঙ্গে কাজটি করতে পারেন, এটি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে অবশ্যই প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা আগেও বলেছি, পরিকল্পনা কমিশনকে শক্তিশালী করা ছাড়া বিকল্প নেই। পরিবীক্ষণ আর মূল্যায়ন তদারকিও বাড়াতে হবে। এছাড়া মানের ব্যাপারে উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য নয়। এপ্রিল পর্যন্ত এডিপির ৫৪ শতাংশ খরচ হয়। আর মে-জুনে আরো ৪০ শতাংশ খরচ হয়ে যায়, যা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি শুনেছি, আমাদের দেশের রাস্তা নির্মাণ ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি। এটা কেন হচ্ছে তা ভেবে দেখা দরকার। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় বাধা হলো ভূমি। এবারের বাজেটে সাধারণ বিষয়গুলো উল্লেখ থাকলেও ভূমির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা হয়নি।

একটি বড় প্রকল্পের কথা বাজেটে উল্লেখ আছে— স্বপ্নের ও সাহসিকতার পদ্মা সেতু। তবে এ ধরনের ৩০-৩৫টি প্রকল্প যদি আমরা তালিকাভুক্ত করি, তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ খরচ এখানে হবে। প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির স্বার্থে পরিকল্পনা কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। অথবা মাননীয় সরকারপ্রধানের অফিসে যুক্তরাষ্ট্রের আদলে শক্তিধর কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজারস নিয়োগ দেয়া যেতে পারে, তারা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ তদারক করবেন। এখন বড় প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলএনজি টার্মিনাল, বিদ্যুৎ প্লান্ট, রেল ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে পদ্মা সেতুর কাজ চলছে। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এদিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারছেন। তাঁর তো সময় কম, অনেক বিষয়ে সময় দিতে হয়, আন্তর্জাতিকভাবে দেশের জন্য লড়াই করতে হয়, কাজেই এ কাজ তদারক করার জন্য একটি আস্থাশীল কাউন্সিল অব অ্যাডভাইজারস গঠন করা যেতে পারে, যারা বৃহৎ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো সার্বক্ষণিক তদারক করবেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারি ব্যাংকগুলোকে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি কতটা ইতিবাচক?

যারা বলেন, করের টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে দেয়া অন্যায়, আমি তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো সামাজিক অনেক দায়িত্ব পালন করে বলে তারা ব্যক্তিখাতের ব্যাংকের মতো হতে পারছে না। উদাহরণ হিসেবে কৃষিঋণের কথা বলা যেতে পারে। কৃষিঋণ ছাড়া আমাদের চলবে না।

এনজিও কিংবা প্রাইভেট ব্যাংকগুলো কিন্তু এ ঋণ দেয় না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকেই এটি দিতে হয়। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নয়, বেসরকারি ব্যাংকে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে খবরও বের করা দরকার; যা কিনা খুব সুখকর নাও হতে পারে। সব মিলিয়ে আমি বলব, ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নে যে ইতিবাচক অবদান রেখেছে, তা আমরা মূল্যায়ন করিনি। এটা শুধরানো দরকার। কয়েকটি পর্যায়ে এ কাজ করা যায়। সর্বজনীনভাবে সবাই বলছে একটি ব্যাংকিং সংস্কার কমিশন গঠনের কথা। ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে কিন্তু এর ঘোষণা ছিল। ব্যাংকের একটি সমস্যার নাম খেলাপি ঋণ। এখানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া সুদের অবলোপন ৪০ হাজার কোটি টাকা। দুটি মিলিয়ে ১ লাখ কোটি টাকার ওপর খেলাপি ঋণ। কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যে, এটা সমাধানযোগ্য নয়। ভারত এবং আরো কিছু দেশে এটি সমাধানের বাইরে চলে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো ওই অবস্থায় পৌঁছেনি। এটি সমাধান করতে গিয়ে হয়তো কিছুটা অসুবিধা হবে। তবে ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করেও কিন্তু সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। পাশাপাশি কর ব্যবস্থাকে শতভাগ সংস্কার করে সহজ ও অটোমেশন করা যেতে পারে। এ দুটি বিষয়ের সমাধান করে যদি ব্যাংকিং সেক্টরকে স্বয়ংক্রিয় দক্ষতার আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে আয়কর ফাঁকির প্রবণতা কমবে এবং বিনিয়োগের দক্ষতা বাড়বে। যদি ব্যবসা-শিল্প সখ্য নীতি প্রণয়ন করা যায়, বিনিময় হারকে সুন্দরভাবে সাজানো যায়, তাহলে ২০২৫ সালে ট্যাক্স জিডিপি অনুপাত ২০ শতাংশ হতে পারে। এতে ওই বছর ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি অনুপাত ৪০ শতাংশও হতে পারে। একই সঙ্গে যদি বিদ্যুত্সহ সব অবকাঠামোয় সংস্কার করা যায়, তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০২৫ সালে ১০ শতাংশ ছাড়াতে পারে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্টিগিলজ বলেছেন, দেশজ আয়ের প্রবৃদ্ধি কোনো বিষয় নয়, এটা দিয়ে কিছু পরিমাপ করা যায় না; কথাটা ঠিক নয়। আমাদের মতো দেশে মোট দেশজ উত্পাদনের প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৪ শতাংশ হচ্ছে আর জনসংখ্যা বাড়ছে ১ দশমিক ৩ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বাড়ছে, যা দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। তাই বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার মূল্যায়ন কী?

এবারের বাজেটের আরো একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে— শিক্ষা খাতে বরাদ্দ শতকরা হারে বেড়েছে। শিক্ষা খাতে এবার বরাদ্দ ৬৫ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা, জিডিপির অনুপাতে চার-পাঁচ বছর আগেও এ বরাদ্দ ছিল ২ শতাংশ; যা এখন হয়েছে ২ দশমিক ৯। বরাদ্দ জিডিপির ৫ শতাংশ ২০২১ সালে সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্জিত হতে পারে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মানের পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্বের অন্য দেশগুলোয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা একসঙ্গে, যা স্বাভাবিক। আমাদের দেশে এখন প্রাথমিক আলাদা আর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা একসঙ্গে। এটি যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া অনেক কলেজের অধ্যক্ষ, অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নকলবাজিতে ধরা পড়ে এখন জেলে আছেন। অনেক অভিভাবকও ছেলেমেয়েকে নকল সরবরাহের জন্য ছোটাছুটি করছেন। এটি শক্তভাবে বন্ধ করতে হবে। আর তাতে মানবসম্পদের গুণগত মান বাড়বে। রাষ্ট্র, অর্থনীতি চালাতে গেলে প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো সর্বজনীনতা। এক্ষেত্রে সবার স্বার্থটা দেখে একটা সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে সবাইকে এক কাতারে শামিল করতে হবে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো, এবারের বাজেটের বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করছে মূল্য সংযোজন করটা কতখানি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যাবে তার ওপর। ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর ধার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবারো বলব, প্রতিটি স্তর থেকে যদি এটা নেয়া যায় তাহলে ঠিক আছে। পৃথিবীর ১৯০টি দেশে মূল্য সংযোজন কর ১৫ শতাংশ আর ৫৫টি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে এ হার ১৩ দশমিক ৮ থেকে ১৪ শতাংশ।

ডিজিটাল বাংলাদেশের যে প্রণোদনামূলক প্রচণ্ড গতি আছে, এ নিয়ে আরো কাজ করতে হবে। শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর ও বৃত্তিমূলক করার কোনো বিকল্প নেই। অনেকেই দাবি করেন, আমাদের শিশু-কিশোর-তরুণসমাজ বিপথে চলে গেছে। আমি এখানে তাদের চেয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়কে বেশি করে দেখি। স্কুলপর্যায়ে পাঠ্যবই কমানোর দিকে নজর দিতে হবে। পাঠ্যবই সুপাঠ্য করতে হবে। আইন করে গাইড বই আর কোচিং সেন্টারগুলোও বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষতিকর ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ে ভাবতে হবে। তাছাড়া ভাবতে হবে আমরা আগামী প্রজন্মকে কীভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেব। মানবসম্পদকে মানসম্মত করার পাশাপাশি নতুন করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, যারা এবারের বাজেট ঘিরে সমালোচনা করছেন, তাদের অগ্রাহ্য না করে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনে সংশোধন করা কিংবা তাদের বুঝিয়ে বলা যে, বাজেট নিয়ে তারা হয়তোবা ভুল করছেন। এবারের বাজেট মোটেও বড় নয়। আসল কাজটা হলো, রাজস্ব আদায় ব্যতীত আমরা বাজেট বাস্তবায়ন করতে পারব না। আর বাজেট বাস্তবায়ন না হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের যে সেবা দেয়ার কথা, মান উন্নয়ন হওয়ার কথা, তা নিশ্চিত হবে না। বাজেট একটা বড় স্তম্ভ, বাজেটের মাধ্যমেই সোনার দেশ গড়ার কাজে বাড়তি শক্তি আনতে হবে।

শ্রুতিলিখন: **রুহিনা ফেরদৌস**